ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1346-1352
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

জাদু বাস্তবতার নিরিখে আফসার আমেদের উপন্যাস: 'অলৌকিক দিনরাত'

রেহানা খাতুন, *সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.07.2025; Accepted: 22.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Magic Realism in literature is currently a subject of much discussion and debate. Though this style originated in foreign lands, it has found its way into contemporary Bengali Fiction as well. However, its seeds were already sown in the fairy tales we heard during our childhood. The reality that was once portrayed through enchantment, mystery and dreams has now returned with a new dimension in today's complex and dialectical social environment. Like renowned novelists such as Mahasweta Devi, Akhtaruzzaman Elias, Amar Mitra, Kinnar Roy— Afsar Amed has also made successful use of Magic Realism in several of his novels. In 'Aloukik Dinraat' he presents harsh, difficult realities through dreams, imagination and fantasy. In the novel Talib, a resident of the village Nupur, has been missing for one and a half years. In his absence, his wife Shabnam suffers greatly, evoking sympathy from the villagers. People are sent to Kolkata to search for Talib. To learn about his current situation, the villagers consult a fortune-teller. Khaled chacha, well known for his dreams, sees Talib multiple times in his sleep and shares the interpretations of those dreams with the villagers. One day, Talib returs— with twenty-eight questions. The villagers being to see him as a character straight out of a fairy tale. From this perception, a new story is born. The novel also explores dream sequences involving an old woman Jaigun. It contains criticism of traditional bookish education and touches upon contemporary politics and the complexities of marital ralationships with finesse. 'Aloukik Dinraat' showcases a blend of reality, fantasy and absurdity, sudden shifts in time, a labyrinthine plot, an atmosphere of fear and suspense and a narrative that often breaks conventional cause and effect logic. These are the key characteristics of the novel, making it a notable example of Magic Realism in Bengali Literature.

Keywords: Magic Realism, Dream, Fantasy, Absurdity, Reality

সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে ভিন্ন মত, ভিন্ন ধারণা আছে। সাহিত্যে বাস্তবতার আনয়ন করলেই সাহিত্যের বাস্তবতা হয়না। কল্পকাহিনির মাধ্যমে যেমন সাহিত্যে বাস্তবতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে আবার বাস্তবতার মধ্যে উঁকি দিতে পারে রহস্যের বাতাবরণ। ছেলেবেলায় শোনা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর দেশ পাড়ি দেওয়া, রাজকন্যা-রাজপুত্রের কাহিনি, সোনার কাঠি-রুপোর কাঠির স্পর্শ, রাক্ষসের কথা তো আমাদের বাস্তব জীবনকে ছাপিয়ে এক কুহক বা মায়ার জগতে পৌঁছে দিত। এ যেন চেতন-অবচেতন মনের খেলা। চেতন মনে বাধাপ্রাপ্ত কোনো বিষয় অবদমিত হয়ে অবচেতন মনে হাজির হয় স্বপ্নের মাধ্যমে। বাস্তবকে তুলে ধরতে গিয়ে শিল্পী সত্তা যখন অবরোধের মধ্যে পড়ে তখন কুহক বা মায়া সেই জায়গা দখল করে। জাদু বাস্তবতা সেই ভাবনারই দোসর। জাদু বাস্তবতা বা ম্যাজিক রিয়ালিজম মূলত একটি ফর্ম বা আঙ্গিক। একটি গল্প কথনভঙ্গী।

ফ্রানৎস্ রো (Franz Roh) তাঁর ‘Nach- Expressionismus: Magischer Realismus: Probleme der neuesten europaischen Malerei’ (1925) গ্রন্থে প্রথম ‘ম্যাজিক রিয়ালিজম’ শব্দটি উল্লেখ করেন। চিত্রকলা বিষয়ক আলোচনায় পোস্ট-এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি সম্পর্কে শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি শব্দটি বাস্তব ও ফ্যান্টাসির মিশ্রণ অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং দৈনন্দিন জীবনে আমাদের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতার মধ্যে কুহক বা মায়ার চমককে বুঝিয়েছেন। অনেকটা সুর-রিয়ালিজম এর সমধর্মী। ১৯৭২ সালে রো-র গ্রন্থটি স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়। লাতিন আমেরিকায় এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। চিত্রকলা থেকে বেরিয়ে এসে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে ‘ম্যাজিক রিয়ালিজম’।

ভেনেজুয়েলার সাহিত্যিক আর্তুরো পিক্‌ত্রি (Arturo Pictri) এবং কিউবার ঔপন্যাসিক আলেজো কার্পেন্তিয়ের (Alejo Carpentier) আধুনিক অর্থে সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রবক্তা। কার্পেন্তিয়ের তাঁর ‘The kingdom of this World’ উপন্যাসে ‘লো বেয়াল মারভিয়োসো’ অর্থাৎ ‘কুহকে ভরা বাস্তব’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯৪৭ সালে। এটি ক্রমে ‘ম্যাজিক রিয়ালিজম’-এ রূপ নেয়। কোর্তাজার (Cortazar), গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্ক্যুয়িজ (Gabriel Garcia Marquez) এই ধারার উল্লেখযোগ্য লেখক। লাতিন আমেরিকার কার্পেন্তিয়ের, গার্সিয়া মার্ক্যুয়িজ জাদু বাস্তববাদী লেখক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের ধারণা হয় জাদু বাস্তববাদ লাতিন আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আসলে তা নয়। বিভিন্ন দেশের মতো ভারতের কথাসাহিত্যেও এই জাদু বাস্তবতার বিষয়টি আছে। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে জাদু বাস্তবতার বীজ লুকিয়ে আছে। যদিও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই ফ্যান্টাসি, কল্পনা, কুহক বা মায়ার বিষয়টি ছিল। ঠাকুরমার ঝুলি, রূপকথার গল্পগুলিতে তার অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। এই কুহক বা মায়া কখনও আমাদের বাস্তবতাকে ছুঁইনি। তবে সেই ফ্যান্টাসিকে আশ্রয় করে স্বপ্নের মাধ্যমে বাস্তবকে ছোঁয়ার ইচ্ছে আমাদের সকলের ছিল। আধুনিক সাহিত্যে এই মায়া বা জাদু অন্য মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে। জটিল দ্বন্দ্বময় জীবন পরিসরে রুক্ষ্ম বাস্তবতাকে তুলে ধরতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যিক কখনও কখনও ম্যাজিক রিয়ালিজমের আশ্রয় নিয়েছেন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’(১৯৯৬), অমর মিত্রের ‘অশ্বচরিত’(১৯৯৮), মহাশ্বেতা দেবীর ‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’(১৯৬৫), কিন্নর রায়ের ‘স্বপ্ন পুরাণ’, ‘ধূলিচন্দন’, অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’, আফসার আমেদের ‘কালো বোরখার বিবি ও হলুদ পাখির কিস্‌সা’, ‘অলৌকিক দিনরাত’ প্রভৃতি উপন্যাসে জাদু বাস্তবতার সার্থক ব্যবহার দেখা যায়। আফসার আমেদের (১৯৫৭-২০১৮) ‘অলৌকিক দিনরাত’(১৯৯৯) উপন্যাসটি জাদু বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা করা হবে। তবে তার আগে আমরা জাদু বাস্তবতার আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নেবো—

১। বাস্তব, ফ্যান্টাসি, উদ্ভটের মিশ্রণ বা পাশাপাশি অবস্থান।

২। চকিত সময় বদলের নৈপুণ্য।

৩। গোলকধাঁধাময় প্লট।

৪। স্বপ্ন, মিথ, রূপকথার ব্যবহার।

৫। প্রকাশবাদী ও পরাবাস্তববাদী বর্ণনা।

৬। রহস্যময়তা ঘনীভূত হবে।

৭। অবাক করা বা চমকিত হওয়ার মতো ঘটনা থাকবে।

৮। আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

৯। ফ্যান্টাসি ও অশিল্পিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব ও সমাজবাস্তবের সমন্বয় ঘটবে।

১০। মূল ঘটনার কোনো কার্য-কারণগত ব্যাখ্যা থাকবে না।

১১। ঐতিহাসিক, নৈতিক প্রেক্ষণ থেকে অতীতের সঙ্গে সংঘাত।

১২। কাল্পনিক নগর, সমাজ থাকবে।

১৩। আখ্যানে ফুটে উঠবে মানুষের চূড়ান্ত ভাগ্য।

আফসার আমেদ এমন একজন কথাসাহিত্যিক যিনি প্রত্যেক লেখাতেই তাঁর কথা বলার স্বর পাল্টান। নিত্য নতুন কাহিনির অন্দরে নিয়ে যান পাঠককে। ‘অলৌকিক দিনরাত’ উপন্যাসের ব্যাকপেজে বলা আছে—

> "চেনাজানা ঘরসংসার তাঁর স্বরে রূপকথায় অচেনা হয়ে ওঠে আর রূপকথা হয়ে ওঠে ধরা-ছোঁয়ার এক আটপৌরে সংসার।"[১]

বাস্তব ও উদ্ভটের মিশ্রণে তিনি 'অলৌকিক দিনরাত' উপন্যাসের প্লট নির্মাণ করেছেন। মুর্শিদাবাদের নূপুর গ্রামের তালিব দেড় বছর পর গ্রামে ফিরে আসে অদ্ভুত কিছু প্রশ্ন নিয়ে। তালিবের স্ত্রী শবনম। স্বামীর অবর্তমানে বাপের বাড়িতে ফিরে যায়নি শবনম। শ্বশুর ভাসুরের সংসারেই থাকে। সংসারে খেটে খায়। ফলে খাওয়ার ব্যাপারে তার কোনো সমস্যা নেই। স্বামীকে হারিয়ে নিজের শখ আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়েছিল। বিলাসিতার, সাজগোজের একটি উপাদান হল কাজল। শবনম স্বামীকে হারিয়ে কাজল পরত না। কেবল শবনম নয়— স্বস্তি ছিলনা গ্রামের মানুষদেরও। শবনমের মনে সুখ খুঁজে দিতে পারলেই যেন তাদের শান্তি।

গ্রামের মানুষ মাঝে মাঝেই দু'একজন লোককে গ্রামের প্রতিনিধি করে কোলকাতায় পাঠায় তালিবের অনুসন্ধানে। কিন্তু সবাই ব্যর্থ হয়। এহেন শবনমের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য গ্রামের বৌ-ঝিদের অদ্ভুত কার্যকলাপ চোখে পড়ে। কেউ শিলাবৃষ্টিতে কুড়ানো বরফ আঁচলে করে এনে শবনমের কলসীতে ভরে দেয়, কেউ ভোরের ফুল কুড়িয়ে এনে দেয়, কেউ দিঘির শালুক তুলে দেয়, কেউ নির্জন বাগানে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে কোকিলের দুর্লভ ডাক শোনায়। "শবনম হাসে, খুশি হয়। কিন্তু চোখে কাজল পরে না।"[২] সময় অতিবাহিত হয়। তালিব ফেরেনা। তালিবকে ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামের বৌ-ঝিয়েরা সন্ধ্যাবাতি জ্বালিয়ে আকাশের সন্ধ্যাতারার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। সন্ধ্যাতারার সঙ্গে কথা বলার সময় আকাশ যাতে মেঘমুক্ত থাকে তার জন্য রাতের বেলা নফল নামাজ পড়ে দোওয়া চায়। কেউ কেউ গনৎকারের কাছে গিয়ে গুনিয়ে আসে। গনৎকার জানায় তালিব জীবনে বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায় আছে তা নির্দিষ্ট করে বলেনা। আর একজন গনৎকার

> "নখে কালি লেপে আয়না বানিয়ে এক শিশুকে দেখতে দিল, শিশুটি 'ক' বলল, আর কিছু বলতে পারল না। সকলে বুঝল 'ক' মানে তালিব 'কলকাতা'তে আছে, না হলে কালনা, কাটোয়া, কাটিহার ইত্যাদি জায়গায়।"[৩]

নূপুর গ্রামের প্রতিটি মানুষ শবনমের দুঃখ দুর্দশায় ব্যথিত সমব্যথিত হয়ে ওঠে।

এই কাহিনির মধ্যে এসে পড়ে খালেদ চাচার প্রসঙ্গ। গ্রামে তার নামডাক স্বপ্ন দেখার জন্য। জীবিত ও মৃত মিলিয়ে প্রতি রাতে নাকি তিন চারজনকে স্বপ্নে দেখে সে। তার কাছ থেকে গ্রামের মানুষ তালিবের বর্তমান অবস্থার কথা জানতে পারে। সে প্রথম স্বপ্নের মাধ্যমে সবাইকে জানায় তালিব একটু অসুবিধার মধ্যে আছে। খালেদ স্বপ্নে দেখে তালিব আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে খালেদ জানায় তালিব খুবই খাদ্যের কষ্টে আছে। পরের স্বপ্নে দেখে তালিব একজন নারীর চুল বেঁধে দিচ্ছে। এই স্বপ্নও নাকি তালিবের দুর্দশাকে, নীতিবিরুদ্ধ কাজকে ইঙ্গিত করে। আরও কয়েক মাস পর খালেদ জানায় সে স্বপ্নে দেখেছে তালিব দুই কাঁধে দুটো সাদা পায়রা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর ব্যাখ্যায় খালেদ বলে তালিব সততায় ফিরে এসেছে। তার কাঁধের দুই পায়রা যেন দুই পবিত্র ফেরেস্তা। এইসব স্বপ্ন দেখার গুরুতর দায়িত্ব পালন করে খালেদ। তারপর সে আবারও স্বপ্ন দেখে। তালিব এক বিশাল পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটি মাছ তার পায়ের কাছে উঠে এসে তার সঙ্গে কথা বলছে। খোয়াবনামা দেখে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে খালেদ জানায়— তালিব বেঁচে আছে, ভালো আছে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে। স্বপ্নবিলাসী খালেদ তালিবকে নিয়ে গান বা রূপকথা গড়ে তুলতে থাকে।

> "কখনও কোনো গানে তালিব ফিরে আসেনি, কোনোদিন ফিরবে না ধরে নেওয়া হয়। কোনো রূপকথায় শবনমের সঙ্গে প্রজাপতি হাঁস ফড়িং ছাগলের মা কথা বলে যায় মানুষের ভাষায়। কোনো মেঘ জানালার কাছে উড়ে এসে তাকে কোথাও কোনো অজানা দেশে উড়িয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দেয়। সারারাত ধরে সেই মেঘে চড়ে সেই রাজকন্যা শবনম উড়ে বেড়ায় পরির দেশে। পরিরা তাকে ফুলের বনে নিয়ে যায়, তার মধু খাওয়ায়। জ্যোৎস্নার সুধার স্বাদ চেনায়। সেই রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে খুঁজে বেড়ায় সেই রাজকন্যাকে। কত বিপদ সঙ্কটে পড়ে। একদিন ফিরে পায় রাজকন্যাকে, তাকে নিয়ে সুখে ঘরসংসার করে। এই তো, এই কথা, এই কথার রূপ, রূপকথা। সেই তো সেই গান, সেই গানের এই রসমাধুর্য। সেই তো গান আর রূপকথা বেঁচে থাকায় লাগে।"[৪]

এইভাবে স্বপ্ন, মিথ, রূপকথার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

তালিব ফিরে আসে আঠাশটা প্রশ্ন নিয়ে। বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে দুটাকা দিয়ে একটি বই কেনে তালিব। বইয়ের সব প্রশ্ন ও উত্তর মুখস্থ করে ফেলে। গ্রামের চায়ের দোকানে বসে এই প্রশ্নগুলো ছুঁড়ে দেয় শিক্ষিত মানুষদের উদ্দেশ্যে। গ্রামের হেডমাস্টার, বি. এস. সি. মাস্টার, পঞ্চায়েত মেম্বার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারেনা।

> "উত্তর দিতে না পারার মধ্যে যে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল, তারপর নূপুর গ্রামের সাধারণ মানুষদের তালিবকে গানে, রূপকথায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিলনা।"[৫]

তালিব নূপুর গ্রামের রূপকথার নায়ক। অন্যদিকে খালেদের স্বপ্নবৃত্তান্তকে যারা এতদিন পাত্তা দেয়নি তারা তালিবের ফিরে আসাতে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে এক অলৌকিক সংযোগ স্থাপন করল।

কেবল তালিবকে নিয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ নয়। উপন্যাসে আমরা আর এক হাস্যকর স্বপ্ন প্রসঙ্গ পাই। অদ্ভুত স্বপ্নটি দেখেছে জয়েদ বুড়োর সহধর্মিনী জৈগুন। স্বপ্নটি এরকমঃ জয়েদ বুড়ো যে কুলো নিয়ে বিড়ি বাঁধে সেই কুলোর ওপর সদ্যোজাত শিশু হয়ে বুড়ো চেঁচাচ্ছে। রেগে গিয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। অসহায় অবোধ এক শিশু— তার মা অর্থাৎ জৈগুন বুড়ি খাওয়ালে খায়, কোলে নিলে আশ্রয় পায়। একে স্বামী তার ওপর সদ্যোজাত শিশু ব্যাপারটা বুড়িকে কম উদ্বিগ্ন করছেনা। স্বামী কখনও কারো শিশু হয় এটা জৈগুন কোনোদিন শোনেনি। বিষয়টির সমাধানসূত্র বের করার জন্য মওলা বক্সের উঠোনে বসে স্বপ্ন বিবরণের আসর। স্বপ্নটির অদ্ভুত কৌতুক রূপটি ছেঁটে নিয়ে মানুষজন খুবই গুরুত্বসহকারে ভাবতে লাগলো।

> "এটি একটি সামাজিক সমস্যাও বটে। একেই বুড়ি বয়েস, তার ওপর কচি শিশুর দায় দায়িত্ব এসে পড়েছে। নিজের পেটের শিশু হলে অন্য কথা ছিল। স্বামীর এ হেন শিশু হয়ে ওঠার ঘটনা অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, স্ত্রী নির্যাতনের ষড়যন্ত্রের গন্ধও হয়ত থাকতে পারে।"[৬]

স্বপ্ন কল্পনার মধ্যে থাকতে থাকতে ঔপন্যাসিক খুব সুন্দরভাবে বাস্তবতার মধ্যে অবগাহন করেছেন। নারী নির্যাতনের মতো সামাজিক ব্যাধির কথা বলেছেন। ফ্যান্টাসি ও সমাজবাস্তবতার দ্বান্দ্বিক পট খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

স্বপ্ন প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে গোলকধাঁধার মতো প্লট নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিক। গ্রামের একমাত্র ঘরামি লোকমান। চাল ছাওয়ার সময়ে গৃহস্থের অনেক গোপন কথা সে জানতে পারে। গ্রামের মানুষ তাই তাকে একটু সমঝে চলে। এই লোকমান ঘরামি জৈগুন বুড়ির স্বপ্নে এসেছিল। সালিশিসভায় জানতে চাওয়া হয় জৈগুন বুড়ির স্বপ্নে লোকমান ঘরামির আগমনের কারণ। এই নিয়ে গ্রামের মানুষ ছড়া কাটে, গান বাঁধে। ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "জৈগুন বুড়ির স্বপ্নে কেন লোকমান ঘরামির আনাগোনা? এটা একটা অভিযোগ। অভিযোগ যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে, অসমতা কপটতার বিরুদ্ধে, বঞ্চনা প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে।"[৭]

স্বপ্নবাসরে এসে তারা ভুলে যায় একত্রিত হওয়ার কারণ। যাইহোক, এই স্বপ্ন দেখার পর জয়েদ বুড়ো আর আড্ডায় যেতে পারছেনা। স্বপ্নপ্রাপ্ত বাস্তব জীবনের সমস্যায় ডুবে যাচ্ছে। বন্ধু মোকসেদ, রউফ ডাকতে এলেও নানা অজুহাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে। একটি বাহানা ছিল গরম ভাতে জৈগুন এমন জোরে কুলোর বাতাস করেছে যে সব ভাত উড়ে গিয়েছে। পেটে খিদে নিয়ে সে আড্ডায় যেতে পারবেনা। এই গল্প আর এক অলৌকিক গল্পের জন্ম দেয়— চকিতে সময়ের বদল ঘটে। তালিবের সংসারে অন্নের অভাব। উড়ন্ত ভাতগুলো তালিবের থালায় গিয়ে পড়ে।

> "তালিব দুঃখে কষ্টে আছে, এমনই অলৌকিকভাবে তারা তালিবের সংকটমোচন করবে।"[৮]

নূপুর গ্রাম স্বপ্নবিলাসী গ্রাম। স্বপ্নের ঘটনাকে অনেকসময় বাস্তব কোনো ঘটনায় মিশিয়ে দেয়। অনেকসময় স্বপ্ন ও বাস্তবের ভেদরেখা ঘুচে যায়। তারা স্বপ্নে যতদূর কথা বলে, তারপর থেকে বাস্তবে কথা বলতে শুরু করে। স্বপ্ন ও বাস্তবের মিশ্রণে গাছপালা, আকাশ-বাতাস বিচিত্র, রঙিন হয়ে ওঠে।

> "রঙগুলো খানিকটা বাস্তবতা থেকে আসে, বাকিটা আসে স্বপ্নকল্পনা অলৌকিকতা থেকে।"[৯]

তালিবকে নিয়ে অন্যরকম এক গল্প শুরু হয়। তালিব কোদাল নিয়ে কারও জমির আল ছেঁচে দিচ্ছিল। সেখানে দুধেল বাছুরসহ একটি গাই এসে তাকে ছায়া করে দাঁড়ায়। মানুষের ভাষায় গাইটা অনেক কথা বলে তালিবের সঙ্গে। নূপুর গ্রামের কিছু মানুষজন নাকি এই কথোপকথন শুনেছে। উড়ন্ত পাখিরাও মানুষের কণ্ঠস্বরে তালিবের সঙ্গে কথালাপ করে। একটা কাল কেউটে সাপ ফণা তুলে সেই সাক্ষাৎকার শোনে। তারপর একখণ্ড মেঘ এসে তাদের ছায়া দেয়। এই অবস্থায় তালিবের চোখদুটো নীলপদ্মের মতো রূপময় দেখায়। তালিবের মাথায় একরাশ জোনাকির তাজ। এর মধ্যে আকাশের মেঘ মাটিতে নেমে এসে একটা জল টলটলে দিঘি তৈরি করে। সেই দিঘিতে সাদা রাজহাঁস খেলা করে। যারা চাষের কাজ করছিল তারা নাকি দিঘিটা দেখেছে। সেই দিঘির দিকে তাকিয়ে থাকলেই জলের তৃষ্ণা মিটে যায়। কারও কারও মতে তালিবের মাথায় জোনাকির তাজ ছিল না— ছিল তারার কণা। এই গল্প নিয়ে কারও মধ্যে কোনো তর্ক বিতর্ক নেই।

> "স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের ঘটনা যেমনভাবে নিঃসংশয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়, নূপুর গ্রামের মানুষদের জীবনযাপনের বাস্তবতা গড়ে উঠতে লাগল যেন স্বপ্নের ঘোরের বাস্তবতায়।"[১০]

তালিবের কাছেও সবকিছু বাস্তব হয়ে ওঠে। এইসময় সে তার কোদাল খুঁজে পায়না। তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় সে কোদাল নিয়েই মাঠে গিয়েছিল। কিন্তু শবনম বাস্তবের মাটিতে পা দিয়ে বলে—

> "হয়তো তুমি নতুন কোদাল কেননি এখনও, পাঁজাতে দাওনি এখনও।"[১১]

তালিব চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি রাষ্ট্র হয়ে যায়। সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রামের সাতাশিটি কোদালকে একজায়গায় নিয়ে আসা হয়। একটি শিশুকে দিয়ে চেনানো হয় তালিবের কোদাল। শিশুটি জানায় সাতাশিটি কোদালের মধ্যে তালিবের কোদাল নেই। এর মধ্যে খালেদ এসে পৌঁছাতেই পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে যায়। যেন এক স্বপ্নের পরিবেশ। স্বপ্নের ভিতর থেকে কথা বলে তালিব। অদৃশ্য কোদালের বাঁট যেন ধরে ফেলে সে। তালিব চমকায় তাকে নিয়ে গড়া গল্পে, তারই চরিত্রের অনুভবের ভিতর। ক্রমে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে। রহস্যময়তার মধ্য দিয়ে কাহিনি এগিয়ে যায়।

নূপুর গ্রামের স্বপ্নবাসরে একটি অভিযোগ আসে। অভিযোগ করে মাঝেরপাড়ার মওলা বক্স। অভিযুক্ত দখিনপাড়ার যমজ দুই ভাই— হাসেম-কাসেম। তাদের ছাইগাদার ছাই একটু হাওয়া দিলেই উড়ে আসে মওলা বক্সের ঘরেদোরে। মওলা বক্সের বউ লালমনের গায়ের রঙ কালো ছিল ঠিকই। কিন্তু সাত বছর ধরে এই ছাই ওড়াউড়ির চক্করে সে আরও কালো হয়ে গিয়েছে। এই কারণে মওলার নাকি তার থেকে মন সরে যাচ্ছে। লালমনকে আর আগের মতো ভালোবাসেনা। এই কথা শুনে সমস্যা আরও গাঢ় হয়ে ওঠে। মজলিশ থমকে যায়। লালমন আরও অভিযোগ করতে থাকে— একটা টিপের পাতাও আর কিনে এনে দেয়না, কোমরের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে থাকলেও জিজ্ঞাসা করেনা, হাটে পুতুল নাচ আসলেও দেখাতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেনা মওলা। সর্বোপরি আর একটা বিয়ে করার কথা চিন্তা করছে। মজলিশের অন্য মেয়েরাও সরব হয়ে ওঠে। তাদের স্বামীরাও তাদের আগের মতো ভালোবাসেনা। তারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এপাড়া থেকে ওপাড়া তাদের প্রেমহীনতা সংক্রামিত করল। নূপুর গ্রামের মানুষ অপ্রেম বিষয়ে আত্মমগ্ন হয়ে পড়ল। পুরুষরাও নিজেদের অপরাধবোধের কথা বুঝে স্তব্ধ হয়ে থাকে। ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "বাইরের উটকো কোনো লোক এসে পড়লে তাদের ব্যবহার হাবভাব ভাবনা-কল্পনা দেখে মনে করতে পারে, এরা বাস্তবতাকে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে। এরকমটা হতে থাকল নূপুর গ্রামে।"[১২]

উপন্যাসে যে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে তা কার্য-কারণের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত হয়না। জৈগুন বুড়িকে স্বপ্ন দেখতে পাঠানো হচ্ছে। আর গ্রামের মানুষ বাইরে পাহারা দিচ্ছে। যাতে জৈগুনের স্বপ্নে লোকমান ঘরামি প্রবেশ করতে না পারে। জৈগুনের বাড়িতে লোকমানকে আসতে দেওয়া হয়নি। বরং সাতজনের একটা দল লোকমান ঘরামির বাড়ির চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। যেন লোকমান কোনোক্রমে বাড়ির বাইরে না যায়। জয়েদ বুড়ো জৈগুনকে ঘুম পাড়াতে, স্বপ্ন দেখাতে নিয়ে যায়। এই অবসরে কথা বলবার অছিলায় প্রত্যেক দম্পতি নিজেদের মধ্যে প্রেম করে। জোড়ায় জোড়ায় তারা মিথুনমূর্তি হয়। এই নৈশব্দের মধ্যে হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর কথা শোনা যায়— ঘরের ফুটো চাল দিয়ে লোকমান ঘরামি বেরিয়ে গিয়েছে। তাদের উদ্বেগের শেষ নেই। তাই বুড়ির ঘরের ত্রিসীমানায় পাহারা আরও জোরদার করা হয়। ইতিমধ্যে জৈগুন বুড়ির ঘুম ভেঙ্গে যায় আর সবাইকে জানায় যথারীতি তার স্বপ্নে লোকমান

ঘরামি এসে উপস্থিত হয়েছিল। অন্যদিকে যারা লোকমানের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল তারা দেখে লোকমান ঘরের খিল খুলে বাইরে বেরোচ্ছে। লোকমানের বউ মজমুন স্বামীর চাল খুলে বেরিয়ে যাওয়ার যে প্রসঙ্গ তুলেছিল তা স্বপ্নকেন্দ্রিক। তার পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এর সঙ্গে লোকমান ঘরামির বাস্তবের কোনো যোগসূত্র নেই।

নূপুর গ্রামের মানুষ যেন স্বপ্নভাণ্ডার থেকে এক একটা স্বপ্ন তুলে নিয়ে দেখছে। তাদের মনে প্রশ্ন হেডমাস্টার, পঞ্চায়েত প্রধান এত শিক্ষিত হয়েও তালিবের করা আঠাশটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছেনা কেন? খালেদ সশরীরে এদের কাছে একটি প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়। জৈগুন বুড়ির স্বপ্নে লোকমান ঘরামির অনুপ্রবেশ ঘটে কেন? হেডমাস্টার সরাসরি জানিয়ে দেয় এর অর্থবোধ তাদের কোনো খাতা বইয়ে নেই। স্বপ্নের মায়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে নৈতিক প্রেক্ষণ থেকে খালেদ বলতে থাকে—

> "কি মানুষ আপনারা! নূপুর গ্রামে আপনাদের এতখানি হেনস্থা হয়ে যেতে হবে স্বপ্নেও ভাবিনি কোনোদিন। ভাবতে পারছিনা তাহলে দেশের কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন?...তোমাদের জন্য দেশের মাটি, মাটি থাকবেনা আর, পাথর হয়ে যাবে।...হয়ত মানুষগুলো সব পাথর হয়ে যাবে। মানুষের অবয়বে শুধু পাথরভরা পৃথিবী, পাথরের মানুষে ভরা পৃথিবী। মানুষ নেই, কোনো প্রাণ নেই, শুধু পাথর আছে, এ কথা ভাবলে ভয় করে না?"[১৩]

এই প্রেমময় জীবনে থাকতে থাকতে তালিবের আর একটি অলৌকিক ঘটনার কথা জানতে পারে পাঠক। চাষের মাঠ থেকে কাজ করে ফিরে এসেছে তালিব। তার গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়ে। সেই ঘামের কয়েক ফোঁটা একটি ছোট ঝিনুকে ভরে নেয় শবনম। পরের দিন সেই ঝিনুকের মুখ খুলতেই শবনম দেখে একটি আস্ত মুক্তো। এই পরিস্থিতিতে সেইখানে এসে উপস্থিত হয় একটি শালিখ পাখি।

> "শালিখটা মানুষের ভাষায় দাবি করে মুক্তোটা তারই পাওনা হবে, সে স্বপ্নে দেখেছে, স্বপ্নে আদেশ পাবার পর চলে এসেছে।"[১৪]

এইকথা শোনার পর শবনম শালিখটাকে আদর করে তার গলায় মুক্তোটা পরিয়ে দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার পর থেকে নূপুর গ্রামের মানুষরা শালিখ পাখি দেখলে তাড়িয়ে দেয়না। শুধু তাই নয়, নূপুর গ্রামের মানুষজন যে স্বপ্ন দেখে শালিখও সেই স্বপ্ন দেখতে পারে। এখানেই শেষ নয়। তালিবের ঘাম থেকে আরও একটি মুক্তো ঝরে। আরও একটি শালিখ সেই মুক্তো পায়। কিন্তু তৃতীয় মুক্তো পাওয়াটা খুব কঠিন কাজ। এটি না পেলে শবনম বিপদগ্রস্থ হবে। বিপদটা এই— শবনম ছোটো হতে হতে কড়ে আঙুলের মতো হয়ে যাবে— প্রাণসংশয় হবে। তালিবের মনে হয়—

> "আগুন জ্বলছে, মাটি কাঁপছে। শবনমকে উদ্ধার করতে না পারলে, জীবনের কী আর থাকে! বাঁচার স্বাদ কোথায়?"[১৫]

তালিব মুক্তোর সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে যায়। তার এই যাত্রা প্রেম পুনরুদ্ধারের জন্য। ঝড়, তুষারপাত, অগ্নি, বন্যা সবকিছুর ভিতর দিয়ে অপ্রতিরোধ্য তালিব চলেছে। তালিবকে ফিরতেই হবে শেষ মুক্তোটা নিয়ে। নূপুর গ্রামের মানুষের বিশ্বাস তালিব শেষ মুক্তোটা নিয়ে ফিরবেই। একদিকে নূপুর গ্রামের মানুষের প্রেমের আবেগ অন্যদিকে তালিব ও শবনমের বিচ্ছেদের কাহিনি আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। নূপুর গ্রামের মানুষদের স্বপ্ন-কল্পনার মাধ্যমে তালিব অদৃশ্য হয়ে যায়— অলৌকিক হয়ে যায়।

উপন্যাসের শেষের দিকে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার সুরকে ধরে দিয়েছেন। কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠককে বাস্তবের মাটিতে এনে ফেলেছেন। প্রশ্নগুলো নূপুর গ্রামের মানুষদের নিয়ে। তারা এত কল্পনায় ভাসে, স্বপ্নের আবেগে মোহিত হয়ে থাকে, তাদের কি কোনো বাস্তবজীবন নেই? উপন্যাস পড়তে পড়তে প্রত্যেক পাঠকের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে। ঔপন্যাসিকও সেই প্রশ্ন থেকেই প্রশ্ন করেন— প্রবল বর্ষণে নিরুপায় হয়ে ভাঙা ফুটো চালার দিকে তারা কি তাকিয়ে থাকতো না? ঘরের হাঁড়িকুঁড়ি বাক্স প্যাটরার মধ্যে ইঁদুরের হুটোপাটির শব্দ কি তাদের বুকে শুন্যতার অনুভব, অন্নহীনতার রূপ খুঁজে দেয়নি? কোনো নারী পুরুষ রাগারাগি, ঝগড়াঝাটি করেনি? কোনো দম্পতি কি সারারাত বিছানায় শুয়ে দুদিকে মুখ ফিরিয়ে স্পর্শহীন থাকেনি? প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হননি, উত্তরও দিয়েছেন। নূপুর

গ্রামের একজন গাছ থেকে পড়ে গিয়ে চলতে ফিরতে অক্ষম হয়ে যায়, কাজকর্ম করতে পারেনা। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে কোনো বধূ মারা যায়। সংসারের দারিদ্র্য সহ্য করতে না পেরে কোনো পুরুষ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। পারিবারিক বিবাদের জেরে খুনোখুনি হয় দুই প্রতিবেশি। সন্তান ভাত না দেওয়ায় কোনো মা সালিশি সভার ডাক দেয়। কোনো ঝিউড়ির স্বামীর ঘর না হওয়ায় বাপ-ভাইয়ের কাছে বোঝা হয়ে বেদনায় দিন কাটায়। কারও জমির ফসল নষ্ট হয়। কেউ আবার টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতে পারেনা। কেউ তার কোদাল বিক্রি করে চাল কেনে। কোনো বধূ প্রতিবেশিদের কাছ থেকে দারিদ্র্য লুকিয়ে রাখার জন্য ছেঁড়া শাড়ি কৌশল করে পরে। ঔপন্যাসিক বলেছেন—

> "সেইসব বাস্তবতা তো আছেই, থাকেই, তাকে অস্বীকার করা যাবেনা, অস্বীকার করার উপায়ও নেই।"[১৬]

'অলৌকিক দিনরাত' উপন্যাসের মধ্যে ঔপন্যাসিক সুচারুভাবে কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন— যা আধুনিক জীবন-সমস্যা কেন্দ্রিক। বর্তমান রাজনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। স্কুলের হেডমাস্টার, বি. এস. সি. পাশ মাস্টার কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত— জীবনধর্মী শিক্ষায় শিক্ষিত নন। গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করে পঞ্চায়েত প্রধান। গ্রামের মানুষের সমস্যা সমাধান করা তার কাজ। কিন্তু উপন্যাসে দেখা যায় পঞ্চায়েত প্রধান গ্রামের অধিবাসীদের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নয় বরং খোশমেজাজে হেডমাস্টারের সঙ্গে লুডো খেলছে। সাম্প্রতিককালের একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে প্রেমের অভাব। অপ্রেমে থাকলে মানুষের সমস্যা আর প্রেমে থাকলে শান্তি মেলে— এই প্রসঙ্গও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রামের মানুষের একে অপরের মধ্যে সদ্ভাব, আত্মীয়তার সম্পর্ক যা বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে তা সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। আমরা আমাদের দুঃখ কষ্টের মূলে অনেকসময় আর্থিক সমস্যাকে দায়ি করে থাকি। কিন্তু আর্থিক সমস্যা নিয়েও নূপুর গ্রামবাসী সুন্দর স্বপ্নবাসর সাজায়। সর্বোপরি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে। একটা কিছু পেয়ে গেলে আর একটার সন্ধানে ধাবিত হই। মনে হয় এটা পেলেই শান্তি মিটবে— আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটবে। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তালিব স্ত্রীকে হারানোর ভয়ে তৃতীয় মুক্তোর সন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়। ফ্যান্টাসি, স্বপ্ন, কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে উপন্যাসটি জাদু বাস্তবতাধর্মী তকমা দাবি করে। আর নূপুর গ্রাম যেন স্বপ্ননগরী হয়ে ওঠে— যে নগরের সন্ধানে আমরা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত চলেছি।

তথ্যসূত্র:

১। আমেদ, আফসার। অলৌকিক দিনরাত। দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৯, কলকাতা, ব্যাক পেজ।
২। তদেব, পৃ: ১১।
৩। তদেব, পৃ: ১২।
৪। তদেব, পৃ: ২২।
৫। তদেব, পৃ: ২২।
৬। তদেব, পৃ: ২৭।
৭। তদেব, পৃ: ৫৮।
৮। তদেব, পৃ: ৪৫।
৯। তদেব, পৃ: ৫০।
১০। তদেব, পৃ: ৩৪।
১১। তদেব, পৃ: ৩৫।
১২। তদেব, পৃ: ২৪।
১৩। তদেব, পৃ: ৬১।
১৪। তদেব, পৃ: ৪৯।
১৫। তদেব, পৃ: ৮২।
১৬। তদেব, পৃ: ৯০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব। কাগজ প্রকাশন, ২০০৩, ঢাকা।
২। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০০০, কলকাতা।
৩। সেন, নবেন্দু (সম্পাদিত)। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা। রত্নাবলী, ২০০৯, কলকাতা।